২
আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরিচয়

আগাপিত তির্কি

ভারতীয় আদিবাসীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) সীমান্তবর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং (২) অ-সীমান্তবর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠী। সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীগুলোর বার্মা, চীন ও বাংলাদেশের সীমারেখার কাছাকাছি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলিতে বসবাস। জাতীয় রাজনীতিতে তারা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অ-সীমান্তবর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যদিও এদের সবচেয়ে বেশী দেখা মেলে ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশে। উভয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব মাতৃ-ভাষা, জীবন-পদ্ধতি, সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির অধিকারী, যেগুলো অনাদিবাসী সামাজিক সম্প্রদায়গুলো থেকে অনেক দিক দিয়ে ভিন্ন। আজকে তাদের অনেকে কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়লেও, বন এখনো তাদের অর্থনৈতিক সম্পদের ভিত্তির অনেকাংশ দখল করে আছে। একটি ব্যাপারে এ দু'টি শ্রেণীর মধ্যে মিল করা যায়, আর তা হল, বাহ্যিক নানা শক্তি, যেগুলো তাদের দমন করার চেষ্টা করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানানোর সংস্কৃতি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনামলে বেশ কয়েকটি আদিবাসী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল : মুণ্ডাদের মধ্যে সরদার লড়াই (১৮৫৮-৯৫) ও বিরসা আন্দোলন (১৯৯৫-১৯০০); ভূমিজদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা (১৮৩২); কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৬৫), কাচা নাগাদের (Kacha Nagas) বিদ্রোহ (১৮৮০ দশকে), ইত্যাদি। এ সকল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে, কতকগুলো আদিবাসী সংস্কার আন্দোলন ঘটে যায়, যেগুলো উচ্চ হিন্দু বর্ণের সাংস্কৃতিক ধারাকেও হার মানায় : কুরুখদের (Kurukhs) (ওঁরাও) মাঝে ভাগৎ (Bhagat) সংস্কার আন্দোলন, ভূমিজদের (Bhumijs) মধ্যে Vaishnavite সংস্কার আন্দোলন, সাঁওতালদের মধ্যে খেরওয়ার (Kherwar) সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি। ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আদিবাসী রাজ্যের স্বীকৃতি আদায়ে বিভিন্ন আন্ত-আদিবাসী রাজনৈতিক সংঘ ও আন্দোলন দল গঠন, উদাহরণস্বরূপ ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীদের মধ্যে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, উত্তর-পূর্ব হিলে হিল স্টেটস্ আন্দোলন, এবং ভিলদের মধ্যে অধিষ্ঠান আন্দোলন। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী আদিবাসীদের মধ্যে সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ঘটনাও ঘটে, যেমন নাগাল্যাণ্ড মুভমেন্ট এবং মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট মুভমেন্ট, আদিবাসী এলাকায় সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত বিচ্ছিন্ন দলগুলো ভূমি সংক্রান্ত বিক্ষোভের সাধারণ সমস্যার

সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং কমিউনিস্ট মুভমেন্ট, যেমন নকশালবাড়ি মুভমেন্ট (১৯৬৭) এবং বিরসা সেবা দল মুভমেন্ট (১৯৬৮-৬৯)।

যোগাযোগের নতুন নতুন দ্বার খুলে গেলে, আদিবাসী অঞ্চলে অনাদিবাসী অভিবাসীদের আগমন বেড়ে যায়। পরবর্তীতে এই দিকটিকে আরও দ্রুত এগিয়ে নেয় খনি খনন প্রক্রিয়া। এ কারণে, আদিম আদিবাসী ও অনাদিবাসী অভিবাসীদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই বা সংঘর্ষের ঘটনা অনেকগুণে বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হুমকির এই পরিস্থিতিতে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলো আদিবাসী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। জবাবে ব্রিটিশ সরকার দমননীতির পথ অবলম্বনের পর, হিন্দু ও মুসলিম কৃষক শ্রেণীর থেকে আলাদা 'আদিবাসীদের' অনুকূলে কিছু নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কৌশল অবলম্বন করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ছোটনাগপুর ও ছত্রিশগড়ের মত কিছু অঞ্চল অনাদিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও, উত্তর-পূর্ব পার্বত্য জেলাগুলোর মত অন্যান্য অঞ্চলকেও মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

তফসিলি উপজাতিদের সরকারি সংজ্ঞা

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের তফসিলি জাতি ও উপজাতি কমিশনের প্রতিবেদনে তফসিলি উপজাতিদের যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয় সেগুলো হল বিচ্ছিন্নতা, জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, 'আদিবাসী ভাষার' ব্যবহার, 'প্রেতবাদী', 'আদিম' অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অনিরামিষি অভ্যাস, উদোম বা আধা-উদোম বস্ত্র, যাযাবর, এবং মদ ও নাচ অনুরাগী। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরে যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল সেগুলো সংস্কারমুক্ত তফসিলি উপজাতি জনংখ্যার অধিকাংশের ক্ষেত্রে খাটে না।

দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সচেতন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো কিন্তু আজকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র প্রদান করে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকারী কুরুখ, মুন্ডা, খাড়িয়া, সাঁওতাল, হো, খাসি, মিজো, নাগা (Kurukhs, Mundas, Kharias,

Santals, Hos, Khasis, Mizos, Nagas), ইত্যাদি আদিবাসীরা খুব আধুনিকচেতা, আর হয়তবা তারা তাদের অনাদিবাসী প্রতিবেশীদের আদিমও ভাবে। ছোটনাগপুর আদিবাসী প্রেক্ষাপটে, আদিবাসীদের নিকট সমগ্র হিন্দু সমাজকে দিখুদের (বিদেশীদের) সমাজ বলে মনে হয়, যে সমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার পথে হুমকিস্বরূপ। দিখুদের সম্বন্ধে আদিবাসীদের ধারণা হল তারা 'লুঠেরা, সমস্যা-সৃষ্টিকারী, শঠ, শোষক, প্রতারক, অনির্ভরযোগ্য, যাদের মধ্যে এ মনোভাব কাজ করে যে, তারা শ্রেষ্ঠ এবং যারা ভীতিকে উস্‌কে দেয়।

আদিবাসী বা আদিম জনগোষ্ঠী

উপজাতি বুঝাতে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায়, আদি অর্থ আদিম/প্রথম এবং বাসী অর্থ অধিবাসী। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পটভূমিতে, 'আদিবাসী' শব্দটি জেনেশুনে বেছে নেওয়া হয় আদিবাসীদের দ্বারা ও আদিবাসীদেরই জন্য, লক্ষ্য ছিল আত্ম-গৌরব ও আত্ম-সম্মান বোধ জানান দেওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রধান প্রধান আদিবাসী দলগুলো কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী :

(১) বংশ ও কুল হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত একক।
(২) ভূমি ও বন তাদের প্রধান জীবিকা মাধ্যম।
(৩) তারা সমাজগত জীবনযাপন ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া লালন করে।
(৪) তাদের গ্রামীণ সমাজগুলো তুলনায় একইরূপ এবং স্তরবিহীন। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রভেদ থাকলেও, তা ব্রাহ্মণ, রাজপুত বা মুসলিম আমলাদের

গ্রামে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(৫) 'বহির শোষকদের' হাতে আদিবাসীরা শোষিত, যেমন অর্থলগ্নিকারী, জমিদার ইত্যাদি। এমনকি স্বাধীনতা লাভের পরও এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে।

(৬) প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলে, যেগুলো প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলো থেকে ভিন্ন। কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের মাতৃভাষা খুইয়েছে।

আদিবাসী সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি উপায়, যে অনুসারে একটি গোষ্ঠী জীবনধারণ করে, চিন্তা করে, অনুভব করে, নিজেদের সংগঠিত করে, উৎসব পালন করে, জীবন সহভাগিতা করে। প্রতিটি সংস্কৃতি নানা মূল্যবোধ, অর্থ এবং জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক কাঠামোর অধিকারী; এগুলো ভাষায়, জীবনধারায়, অঙ্গভঙ্গিতে, প্রতীকে এবং ধর্মানুষ্ঠানে দৃশ্যমানভাবে প্রকাশিত। বিগত বছরগুলিতে আদিবাসী সংস্কৃতি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশেষ ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যমে একটি স্পষ্ট স্বাতন্ত্রতা অর্জন করেছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, প্রকৃতির দান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে, সম্মতি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আদিবাসী ধরন। এটা নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করে গাঁও সভায় (গ্রাম-সভায়)। এ সভায় সকল পরিবার-প্রধানের সমান কথা বলার সুযোগ থাকে। পঞ্চায়েত নেতা কিন্তু প্রধান নন, তিনি হচ্ছেন 'সমদের মধ্যে প্রথম', একজন চেয়ারম্যান। তিনি সদস্যদের অভিমতগুলো প্রকাশ করেন এবং তাদের সুযোগ দেন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। একজন আদিবাসী ঈশ্বরের নামে এবং সভার প্রবীণদের (পাংখে) নামে শপথ নিয়ে থাকে। এইভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটায়। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আজকের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, যেগুলো জনগণ নয় কিন্তু অভিজাত শাসকদের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে, আদিবাসীদের মধ্যে বর্ণভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের কোন স্থান নেই। তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান : তাদের সামাজিক কাঠামোয় সমতাবাদ, তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, এবং তাদের ঋতুভিত্তিক ও সামাজিক নাচ-গানে প্রকাশিত জনমুখী শিল্প।

তবে, যে সকল মূল্যবোধের কথা বলা হল, এগুলো যে আজকের আদিবাসী সমাজে সর্বাত্মকভাবে উপস্থিত, তা কিন্তু নয়। এ সমাজ লক্ষণীয়ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে, সম্পদগুলো হয়ে পড়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আর সামাজিক স্তরবিন্যাস ও প্রতিযোগিতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদ, ভোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, অসাধুতা, ক্ষমতা ও অর্থের লোভ, সহিংস পথ অবলম্বন, অন্যদের জন্য ভাবনাহীনতা, দরিদ্র, অসহায়, নারী ও ছেলেমেয়েদের অধিকার নির্মমভাবে মাড়িয়ে যাওয়া এগুলোই হল আজকের দিনে শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের কিছু ধ্বংসাত্মক মন্দ-প্রভাবের উদাহরণ, যেগুলো আদিবাসী সমাজগুলোকেও প্রভাবিত করছে। কিন্তু এ মন্দতাগুলো আদিবাসী কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলোর পরিপন্থী, এ সকল কেন্দ্রীয় মূল্যবোধের কয়েকটি হল, যিনি সর্বাতীত তাঁর সর্ব-পরিব্যাপক প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান বা সচেতনতা, প্রবীণদের সম্মান, লিঙ্গ সমতা, সামাজিকতা, আতিথেয়তা, সংহতি ও সহভাগিতার মনোভাব, সমাজবোধ, এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এ সকল মূল্যবোধের সাথে একজন আরও যোগ করতে পারে অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহৃদয়তা, মৌলিক সততা, কঠোর শ্রম, সৃজনশীলতা, সাদাসিধা জীবনযাপনে খুশি ও আনন্দ, প্রকৃতি প্রেম এবং ভূমি ও জমির প্রতি বিশেষ টান। আরও উল্লেখ করা যেতে স্বাধীনতা প্রেম, পিতামাতার শৃঙ্খলিত জীবন, বিভিন্ন পালা-পার্বণের মাধ্যমে জীবনকে উদ্‌যাপন এবং ভবিষ্যৎ আশার কথা।

আধুনিক শিল্প-জীবন সঙ্গে করে অনেক ভাবনা বয়ে আনে। এ জীবনের ফলাফল এ সকল ক্রমবর্ধমান ঘটনায় লক্ষণীয় : মাদকাসক্ত, পরিবার ভাঙ্গন, সম্পর্কের অবনতি, ঝগড়া-ঝাটি, সহিংসতা, অপরাধকর্ম। এগুলো সবই আদিবাসী সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক

মর্যাদাহানির চিহ্ন। এ সকল সমস্যার মাঝে আদিবাসী সমাজগুলোর করণীয় হল আজকের জগতে তাদের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলোর আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ মূল্যবোধগুলো প্রদান করবে এক ধরনের আদর্শ নমুনা, যেগুলোর আলোকে আদিবাসী সমাজগুলোকে মূল্যায়ন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই দরকার।

আদিবাসী সমাজ এবং মণ্ডলী

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী সমাজ খ্রীষ্টধর্মকে বরণ করে নিয়েছে, আর তাদের সংখ্যা বেশ লক্ষ্য করার মত। মণ্ডলী তার সুসমাচার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাস গ্রহণে ও স্বীকারে আদিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের সে খ্রীষ্টেতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যাতে তাঁর জন্য প্রেমেতে তারা পূর্ণ পরিপক্বতায় বেড়ে উঠতে পারে। এর আগে, আদিবাসীদের ঈশ্বর বিশ্বাস, পিতৃপুরুষদের আত্মা, আত্মার বিদ্যমানতা, ইত্যাদি এগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি জটিল ধর্ম বিশ্বাস। তাদের অর্থনীতি মূলত ভোগ এবং আদান-প্রদান ভিত্তিক ছিল।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র গভীরভাবে পরস্পর সংযুক্তই ছিল না, নিরন্তর পরিবর্তনশীলও ছিল। আদিবাসীরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে, পরস্পর সংযুক্ত এ সকল ঘটনা ঘটে যায় : অনুচিন্তন, গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, অভিযোজন এবং আত্মীকরণ। তার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আজকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা হল যে, মানুষের মন ও হৃদয়ের মধ্যে যা-কিছু সৎ ও মঙ্গলময় অথবা বিভিন্ন জাতির উপাসনা পদ্ধতি ও রীতিনীতির মধ্যে যা-কিছু কল্যাণকর, তা শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি একে পরিশুদ্ধ করতে, উন্নীত করতে এবং পূর্ণতা দান করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব হয় এবং মানুষ সুখী হয় (দ্র: খ্রীষ্টমণ্ডলী, ১৭, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)।

খ্রীষ্টধর্ম অর্থপূর্ণ উপায়ে আদিবাসীদের কিছু চাহিদা পূরণ করেছে। এ সকল চাহিদা ছিল সামাজিক ও ধর্মীয়, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, এগুলোর কোন একটি মাত্র নয়। সুতরাং, খ্রীষ্টমণ্ডলীতে প্রবেশের আন্দোলনকে আদিবাসীদের সার্বিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে, এর অর্থ বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অবিচার থেকে আদিবাসীদের মুক্তি। মণ্ডলী তাদের গভীরভাবে অনুভূত চাহিদাগুলো পূরণ করেছে এবং তাদের যুগিয়েছে একটি সুষ্ঠু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের আশা। পাশাপাশি, এ কথাও স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের নতুন গৃহীত বিশ্বাসের কারণে নিজেদের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানা রকম উৎপীড়ন-নিপীড়ন আদিবাসীদের সহ্য করতে হয়েছে। তবে এসবের মুখে তারা অটল থেকেছে এবং আদিবাসী সমাজগুলোর নতুন নতুন প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে আদিবাসী সমাজগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তন ঘটে তাদের মনোভাবে ও আচরণ পদ্ধতিতে। তাদের আদিবাসী পরিচয়ে ও ব্যক্তিত্বে তারা হয়ে উঠেছে সংস্কারমুক্ত এবং বলিষ্ঠ। তাদের ‘নতুন’ পরিচয় কোন মতেই পুরাতন পরিচয় না হলেও, এটা কিন্তু পুরাতন পরিচয়ের অনেক দিককে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যেমন জ্ঞাতি সম্পর্ক, একই গোত্র ও সম্প্রদায়ের বাইরে বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম (অবশ্য এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে), বিধবা বিবাহ, প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগে বিশ্বাস, ঐতিহ্যবাহী ফসল সংগ্রহ অনুষ্ঠান, গবাদিপশু উৎসব, ইত্যাদি। সর্বোপরি, বৃহত্তর খ্রীষ্টীয় জগতের অংশ হয়ে ওঠার মাধ্যমে খ্রীষ্টান আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সমাজের সামাজিক সীমারেখা অতিক্রম করেছে। মানসম্পন্ন শিক্ষার কারণে, এই পরিচয় তাদের সাহায্য করেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে।

আদিবাসী পরিচয়

ভারতীয় আদিবাসীদের রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্ম, আর এ ধর্মকে তারা 'আদি-ধরম' বলে অভিহিত করে, যার অর্থ তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি, মূল ও সূচনা (আদি)। এরূপ বিশ্বাস বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন সর্বপ্রাণবাদ, 'আদিমবাদ', আদিম বা প্রাকৃতিক ধর্ম, জনজাতি ধরম, সরনা ধরম, সারি ধরম, সংসারি ধরম, জাহেরা ধরম (janjati dharam, sarna dharam, sari dharam, sansari dharam, jahera dharam) ইত্যাদি। মুণ্ডা ধর্মে সঠিক অর্থেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর, সৃষ্টি, পৃথিবী, মানুষ ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাবনাগুলোর বিষয়ে হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্মের ন্যায় বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও, আদিবাসী ধর্ম একটি স্বতন্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠ ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। তবে, ভারতের আদমশুমারীতে আদিবাসীদের বলা হয়েছে যেন তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় 'অন্যান্য' বলে উল্লেখ করেন। এইভাবে, যে সকল আদিবাসী খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধ নয় তাদের অধিকাংশ নিজেদের উল্লেখ করেছে হিন্দু বলে। এটা ন্যায়সঙ্গত নয় আর সংঘ পরিবারের অনেক ঢাকঢোল পেটানো 'ঘার ওয়াপসি' (home-coming) কার্যক্রম একটি অর্থহীন কার্যক্রম, কেননা এ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বধর্মকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, আদিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু !

আদিবাসীরা হিন্দু নয়। হিন্দুধর্মের আছে ধর্মশাস্ত্র, যেমন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য। অপরদিকে আদিবাসীদের আছে শুধুমাত্র নানা মৌখিক ঐতিহ্য, তাদের সৃষ্টি কাহিনীর আকারে, যেমন কারাম (Karam) গল্প, আসুর কাহানি (Asur Kahani) ইত্যাদি। হিন্দুদের বিশ্বাস নির্গুণ ও সাগুন ব্রহ্মায়, যখন আদিবাসীদের বিশ্বাস পরম সত্তায়, যাঁকে তারা বিভিন্ন নামে ডাকে। হিন্দুরা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজারী, কিন্তু আদিবাসীরা শুধুমাত্র পরম সত্তার পূজারী।

হিন্দুধর্ম বর্ণ এবং জাতপ্রথার উপর দাঁড়িয়ে যা ব্রাহ্মণদের আধিপত্যকে স্থায়ী রূপ দান করে। অপরদিকে, আদিবাসী ধর্মে জাতপ্রথার কোন স্থান নেই। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে এটা বিভক্ত। সামাজিক দিক দিয়ে, তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলে কেউ নেই। এমনকি সাংবিধানিক দিক দিয়ে, আদিবাসীরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে ভিন্ন, কেননা সংবিধান তফসিলি জাতিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। হিন্দু বিবাহ আইন এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন থেকেও এটা স্পষ্ট যে, এ আইনগুলো আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বর্ণবাদী সমাজের মুখোমুখি

হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোর হুমকির মুখে, আদিবাসী পরিচয় একটি ক্রান্তিস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর মতে, আদিবাসীরা আর আদিবাসী নয়, বনবাসী (বনের অধিবাসী) মাত্র ! এই জাতিকেন্দ্রিক এবং বিদ্বেষপূর্ণ খেলা, আদিবাসীরা যারা তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস নিয়ে একটি বিশেষ সমাজ গঠন করে, সেই তাদের খোদ পরিচয়ের ক্ষতিসাধন করছে। তাদের এই পরিচয় বর্ণ-জর্জরিত হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর উদ্দেশে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। হিন্দু ধর্মোন্মাদীরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ধর্মের প্রতি আদিবাসীদের প্রলুব্ধ করার, তাদেরকে অস্পৃশ্য করে তোলার এবং নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মই বা সিঁড়ির একেবারে নিম্নধাপে তাদের ঠাঁই দেওয়ার। তারা এ কাজটি করছে ইচ্ছাকৃতভাবে– বহুজাতিক, বহু সাংস্কৃতিক এবং বহু ভাষী বাস্তবতাকে তাদের এ সকল বিপজ্জনক ধ্বনির মাধ্যমে উপেক্ষা করে : হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান (এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক জাতি)।

আদিবাসীদের বনবাসী হিন্দু আখ্যায়িত ক'রে, হিন্দুত্ববাদীরা সফলকাম হবে ভারতের আদিম বাসিন্দা হিসেবে আদিবাসীদের পরিচয় মুছে ফেলতে এবং বর্ণবাদী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার একেবারে তলভাগে তাদের ধর্মান্তরিত করতে। এই উপায়ে, ৮০ মিলিয়নের অধিক আদিবাসী উচ্চ বর্ণের মানুষদের জন্য একটি সস্তা শ্রমশক্তিতে পরিণত হবে। এইভাবে, আদিবাসীরা যারা হিন্দুকরণের এই বা ঐ ধরনের ফাঁদে পড়ে, তারা তাদের স্বকীয় পরিচয় পুরোপুরি মাটিতে মিশিয়ে দেয় আর নীরব সংস্কৃতির শিকারে পরিণত হয়। এটা একটা মারাত্মক প্রাণঘাতি

প্রক্রিয়া ! সুতরাং, আদিবাসী সমাজ এই বিপর্যয় যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে, তাদের জন্য ততই মঙ্গল !

একটি কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যে

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এ শিক্ষা দেয় যে, "বর্তমান জগতের সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ অথবা যারা কোন না কোন ভাবে নিপীড়িত, তাদের সকলের আনন্দ ও প্রত্যাশা, দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা

খ্রীষ্টানুসারীদেরই আনন্দ ও প্রত্যাশা, দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা" (বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী, ১)। প্রতিটি জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের মাঝে মূল্যবান যেসব ঐশ্বর্য ঈশ্বর বণ্টন করে দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি এ সকল খ্রীষ্টানুসারী গভীর সম্মান প্রদর্শন করে, তারা তাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তারা তাদের জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং জগতের রূপান্তরসাধনের সঙ্গে জড়িত। তারা জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পাশ কাটিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে সম্মান ও প্রেমের একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও লালন করে আর এইভাবে জগতের সর্বত্র শান্তি স্থাপন করে। আজকে ভারতীয় খ্রীষ্টান আদিবাসীদের এটাই হল ভূমিকা !

বাস্তবিকপক্ষে, আদিবাসীদের অবশ্য কর্তব্য হল, ভারতে বহুজাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক সমাজ ব্যবস্থায় তাদের সুন্দর সংস্কৃতি ও পরিচয় সংরক্ষণ, বিকাশ ও সমর্থন করা। এলক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন :

প্রথম:, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বা ক্ষমতাপন্ন করে তোলা, উদাহরণস্বরূপ এগুলির মাধ্যমে : (ক) তাদের নিজ নিজ সমাজে নিজেকে সাহায্য করি দল (Self-Help Groups) গঠন করা, (খ) তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সঠিক শিক্ষাদান, এবং (গ) সমবায় সমিতি, বাজার সমিতি গঠন করা। তাদের সর্বোপরি আত্মকর্মসংস্থান পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে, ক্ষতিকর মদপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে এবং নিজেদের সমাজের সক্রিয় পরিচালক হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আদিবাসী ভাষা ও মৌখিক সাহিত্যকর্ম এবং আদিবাসী সংস্কৃতি ও ধর্মের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে স্কুল সিলেবাসভুক্ত করা। তাদের নিজ সমাজের অধিকার রক্ষায় এবং সুবিচার পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য আদিবাসীদের মধ্যে কাউকে কাউকে এল.এল.বি. (আইনে স্নাতক) কোর্স গ্রহণ করতে হবে। তাদের আরও করণীয় হল তাদের সংস্কৃতির প্রসারে মুদ্রণ মাধ্যমের ব্যবহার ঘটানো এবং সংঘ পরিবারের ভয়াবহ কার্যক্রমের বিরোধিতা করা। আদিবাসী স্বার্থ ও মঙ্গলের পরিপন্থী কিছু সরকারী নীতিমালার মন্দ প্রভাব জনসম্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের মাধ্যমগুলো হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান আদিবাসীদের মধ্যে একতা সুপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা, উদাহরণস্বরূপ এগুলোর মাধ্যমে : (ক) সাংস্কৃতিক পর্ব ও উৎসব একসঙ্গে উদ্‌যাপন, (খ) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নৃত্য উৎসবের আয়োজন, (গ) প্রতি বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন, এবং বিশেষ করে (৪) সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানব যোগাযোগ জোরদার আর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে একসাথে মিলে কাজ।

সবশেষে, রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বশাসনকে আদিবাসীদের জোরদার করে তুলতে হবে, আর তা করতে হবে গ্রাম-সভা ও পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক আইন-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে। এ সকল উপায় অবলম্বন ক'রে, আদিবাসীরা যে শুধুমাত্র তাদের পরিচয় সংরক্ষণ এবং তাদের সংস্কৃতির গতিশীল উৎকর্ষসাধন ও প্রাসঙ্গিক রূপান্তর নিশ্চিত করবে তা নয়, পাশাপাশি তারা একটি অনেক বেশী গণতান্ত্রিক ও মানবিকতাসম্পন্ন ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রাখবে।